বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামি নির্দেশনার প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা

ড. আমীর হোসেন*

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল**

*[**Abstract:** Since time immemorial, Bangladesh has been home to pious men. As a Muslim-majority country, Bangladesh has always been advocating for peaceful and safe life as most Muslim countries have always done. While other countries of the world were poisoned with the germ of terrorism, Bangladesh was known as the land of peace and security. However, the situation has now changed. Terrorism and militancy is spreading also in Bangladesh due to multidimensional reasons. Sometimes by leveraging the piousness of the nation, attempts are being made to spread terrorism in the country, confusing the principles and directions of Islam for its directions among some ordinary Muslims. As a result, terrorism, also in the name of religion, is taking roots in Bangladesh. Insecurity and instability have descended in people's lives. This article analyzes the role of Islam in counteracting militancy and terrorism and the practical application of Islamic injunctions in establishing peaceful society by eliminating terrorism from Bangladesh.]*

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। '৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশেও এটি একটি সর্বগ্রাসী সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের 'হলি আর্টিজেন' রেস্তোরাঁয় এবং ৯ জুলাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাআত শোলাকিয়ায়

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

* * সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড[১] জাতিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে। এটি ধর্মপ্রাণ মানুষকে ব্যথিত করেছে, কারণ নৃশংস এই হামলা ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে ধর্মের নামে। অথচ ইসলাম ধর্মের সাথে এ জাতীয় হামলা ও হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম বরং সব ধরনের সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা থেকে মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্পদ সুরক্ষাকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং এ লক্ষেই ইসলামের অসংখ্য বিধান ও উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকা, কুরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল জানার কারণে ধর্মের কিছু বিষয়কে দেশে দেশে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনার রসদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ সর্বগ্রাসী সমস্যা সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও নির্দেশনার উপস্থাপন এবং বাংলাদেশে ইসলামি নির্দেশনার প্রয়োগ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিকার, প্রতিরোধ ও নির্মূলের উপায় অনুসন্ধান করা সময়ের একান্ত দাবি। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশে ইসলামি দিকনির্দেশনার আলোকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও নির্মূলের উপায় অন্বেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির (Historical and Analytical Method) প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত নীতিমালা এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ সম্পর্কিত প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমীক্ষা, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রেক্ষাপট ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকন্তু এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে বিরাজমান সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের উক্ত নির্দেশনা প্রয়োগের যৌক্তিকতা উপস্থান করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক বেশ কিছু রচনা রয়েছে এবং এ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ইসলামি নীতিমালার আলোকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের নির্মূলের উপরও বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতও এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং থেকে প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম (২০১০) -এর *জিহাদ ও জঙ্গিবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*; কারুবাক থেকে প্রকাশিত বি. এম. জাকির হোসেন (২০২০) এর '*জঙ্গিবাদ ও ইসলাম কোন সত্যটা জানলাম*'; আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (২০০৬) এর '*ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ আলোচিত অনালোচিত কারণসমূহ*'; ইহইয়া-উস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম (২০২২) এর *ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস* -প্রভৃতি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও ইন্টারনেশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ থেকে ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ (২০১৬) এর সম্পাদনায় '*জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ*' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলণ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন নামে ৩৪ টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

কিন্তু অদ্যাবদি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সর্বজন গৃহীত কোনো সংজ্ঞা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সর্বসম্মত কারণ কিংবা সন্ত্রাস নির্মূলের সর্বজন গৃহীত কোনো পদক্ষেপ ও পদ্ধতি আলোচিত হয়নি। এছাড়া প্রতিনিয়ত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ধরন ও মাত্রা পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই সকল সভ্য সমাজে সমসাময়িক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে ইসলামি নির্দেশনার প্রয়োগ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে উপায় নির্ণয়ে তেমন কোনো গবেষণা কার্যক্রম নেই বিধায় এ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে হলি আর্টিজেন ও শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে পরপর ভয়ঙ্কর দু'টি হামলার মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা ও গবেষণা করা এবং এ সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সকলের সামনে তুলে ধরা সময়ের একান্ত দাবি। এগুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ইসলামি নির্দেশনার প্রয়োগ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের পন্থা অনুসন্ধান করা হয়েছে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিচয়

সন্ত্রাস হলো কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা।[২] যে কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বা বশ

মানানোর নীতি অবলম্বন করা।[৩] ব্যক্তি বা সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষেই তা হোক না কেনো, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়, তাই সন্ত্রাসবাদ।[৪] কাজেই অন্যায় কোনো কাজ সম্পাদন বা অবৈধ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পেশি, লেখনী, মেধা, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে যে কোনোভাবে চাপ প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করানোর প্রথা ও পদ্ধতিই সন্ত্রাস।

সন্ত্রাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ Terror. Terror শব্দের অর্থ হচ্ছে, A feeling of extreme fear, prison situation or thing that makes you very afraid।[৫] সন্ত্রাসের আধুনিক আরবি প্রতিশব্দ 'ইরহাব' (إرهاب) শব্দটি আল-কুরআনে বিভিন্নস্থানে ভয় অর্থে ব্যবহৃত হলেও সন্ত্রাস অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মূলত পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় তা প্রকাশের জন্য ফিৎনা (فِتْنَة) ও ফাসাদ (فَسَاد)[৬] শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ব্যাকরণগত বিভিন্ন রূপান্তরসহ 'ফিতনা' শব্দটি ৩৪ বার এবং 'ফাসাদ' শব্দটি ৫০বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] পবিত্র কুরআনে বারংবার শব্দ দু'টি উল্লেখ করে অপরাধের গভীরতা, সুদূরপ্রসারী কুফল ও কঠোর শাস্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

ফিতনা (فِتْنَة) অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।[৮] ফাসাদ হলো বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি। তাই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লড়াই, ঝগড়াসহ এমন কাজ হলো ফিৎনা–ফাসাদ যাতে মানুষের সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়।[৯] আল-কুরআনের ফিতনা ও ফাসাদ শব্দ সম্বলিত আয়াতসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের ঈমান, জীবন-সম্পদ, ইযযত, আব্রু, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যেসব কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং যেসব কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় তা-ই হলো ফিতনা ও ফাসাদ।

জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের বর্ধিত এবং অধিকতর সংঘবদ্ধ রূপ। এ কারণে সকল ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জঙ্গিবাদ বলা হয় না বরং বিশেষ কোনো আদর্শ বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জঙ্গিবাদ বলে অভিহিত করা হয়। জঙ্গি শব্দটি জঙ্গ বা জংগ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো- যুদ্ধ, লড়াই, তুমুল

কলহ, প্রচণ্ড ঝগড়া।[১০] অতএব; জঙ্গি অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ সংক্রান্ত, সৈনিক, সাহসী, দাঙ্গাবাজ।

সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে, জঙ্গিবাদ এক ধরনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য থেকে উৎসারিত, যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর জন্য সহিংসতার পথ বেছে নেয়া হতে পারে। আর সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের একটি পথ হতে পারে আবার আলদা একটি আচরণ হতে পারে যেখানে মূল লক্ষ্য আতঙ্ক তৈরি।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কারণ

বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ব্যাপক বিস্তার বিশ্বব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কারণকে এককভাবে দায়ী করা চলে না। গবেষণায় দেখা যায় যে, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের রয়েছে বৈচিত্রময় ও বহুমাত্রিক কারণ। যা সময়, অঞ্চল, গোষ্ঠী ও উদ্দেশ্যভেদে ভিন্নতর হয়। কোথাও সন্ত্রাসবাদ ধর্মীয় আবরণে প্রসারিত হয়েছে; আবার কোথাও রাজনৈতিক মেরুকরণ থেকে এর জন্ম হয়েছে। কোথাও শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য; আবার কোথাও দমন-পীড়নের প্রতিশোধপরায়ণতা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তারের বহুমাত্রিক কারণ রয়েছে। কমান্ডার খন্দকার আল মঈন, বিপিএম (বার) মনে করেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদে জড়ানোর অন্যতম প্রধান কারণ আদর্শগত বা ধর্মীয় প্রত্যয়। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জড়ানো ব্যক্তিরা এমন চরমপন্থি গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেগুলো তাদের মতাদর্শগত বা ধর্মীয় বিশ্বাস পূরণের পথের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই বিশ্বাসগুলো তাদের সহিংসতাকে একটি পবিত্র বা নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখতে সহায়তা করে। এটি অনেক ক্ষেত্রে লোভনীয় হতে পারে। এ ছাড়াও এই মতাদর্শ ধর্ম, জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। যে ব্যক্তিরা বর্তমান আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বিতৃষ্ণা বোধ করে, তারা জঙ্গিবাদী মতাদর্শের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।[১১]

সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কারণ অনুসন্ধানের জন্য দেশের তরুণদের ভাবনা জানতে *দৈনিক প্রথম আলো*'র উদ্যোগে ওআরজি-কোয়েস্ট (Org-Quest Research) দেশেব্যাপী একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। তাতে দেখা যায় যে, দেশে জঙ্গিবাদের উত্থানকে আর্থসামাজিক বিভিন্ন সমস্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। জরিপে অংশ নেয়া তরুণদের দৃষ্টিতে, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহার, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক

ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি ও অশিক্ষার মতো বিষয়গুলো জঙ্গিবাদ উসকে দিতে প্রভাবকের ভূমিকা রাখছে।[১২]

সার্বিকভাবে সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীগণ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার ও ভুল ব্যাখ্যা, ধর্মের সমালোচনা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রভৃতি বিষয়কে জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির ধর্মীয় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। আর মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি ও অশিক্ষাকে সামাজিক কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহার

ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সমাজের একটি শ্রেণি নিজ স্বার্থ লাভের জন্য ইসলামের জিহাদ ও খিলাফতের ধারণাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গিবাদের পথ বেছে নেয়। ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শ প্রচার ও অনুসরণের পরিবর্তে জঙ্গি পন্থায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করে সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত হয়। এসকল কাজে তারা দুর্বল ঈমানদার প্রকৃতির মানুষকে শাহাদাতের মাধ্যমে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে জঙ্গি কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। তারা ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি সহনশীলতার শিক্ষা ভুলে যায়। ইসলাম যে হত্যা নিষিদ্ধ করেছে এবং সন্ত্রাস ও ফিতনা যে হত্যার চেয়েও ভয়ানক অপরাধ সেটা ভুলে যায়। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে, ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে এর অনুসঙ্গ হিসেবে। কোথাও কোথাও ধর্মীয় কারণ মুখ্য হয়ে উঠলেও সেগুলোর নেপথ্যে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিশ্ব অর্থনীতি।

আধুনিক সমাজ গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অপরাধ চিন্তক ও মুসলিম মনীষীগণের মতে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার এবং ধর্মের প্রতি অবমাননাকর আচরণ বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রসারের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র *দৈনিক প্রথম আলো* দেশে জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে সারা দেশের তরুণদের মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করে। এ জরিপে অংশগ্রহণ করা ৫৮ শতাংশ তরুণ মনে করেন, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের কারণে জঙ্গিবাদ বাড়ছে। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশ ধর্মের অপব্যবহারের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন; আর ২৫ শতাংশ জোর দিয়েছে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার বিষয়টিকে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারকেও তরুণদের একটি অংশ জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির কারণ মনে করেন। তাদের মতে, ইসলাম ধর্ম নিয়ে দেশে ও দেশের বাইরে অনেক

সমালোচনা আছে; যেগুলো সঠিক নয়। এসব নেতিবাচক প্রচারণার জবাব দিতে গিয়ে অনেক তরুণ জঙ্গিবাদের মতো চরমপন্থায় আকৃষ্ট হয়।[১৩] সাম্প্রতিক কালে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রগতিশীলতার নামে কিছু ধর্মবিদ্বেষী ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আক্রোশ, ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবি মুহাম্মদ (সা.) -কে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য ও ব্যঙ্গচিত্র প্রচার করছে। এর জবাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জিঘাংসা থেকেও আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেকারত্ব ও দারিদ্র্য

বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য জঙ্গিবাদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বর্তমানে মাত্র ১০% ধনীর হাতে বিশ্বের মোট সম্পদের ৭৬% সম্পদ রয়েছে।[১৪] ফলশ্রুতিতে দিনে দিনে বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এ দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে হতাশাগ্রস্ত তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সুযোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিকল্পনাকারীরা সহজেই ছাত্র ও যুব সমাজকে নগদ অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। এভাবে তরুণদের একটি অংশ জঙ্গিবাদের মত ভুল পথকে বেছে নেয় এবং একজন সম্ভাবনাময় যুবক হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী। তাই বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতাকে জঙ্গিবাদের একটি বড় কারণ মনে করেন গবেষকরা। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার দখলের রাজনীতিও জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ বিস্তারে সহায়তা করে। মাদক, চোরাচালান ও অস্ত্রসহ অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য এ সকল অবৈধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের লালন, পরিচর্যা ও সহায়তা করে থাকে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়

পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অশিক্ষা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ উত্থানের অন্যতম কারণ। আজ সারা বিশ্বের তরুণ ও যুবসমাজ মাদকাসক্তি, জুয়া, বেহায়াপনা ও চরিত্রহীনতাসহ নানাবিদ অনৈতিক কাজে নিমজ্জিত রয়েছে। এছাড়া সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতার জন্য শিশু-কিশোররা মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই শিশু-কিশোরদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটছে না। অধিকন্তু সমাজের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সম্ভাবের অভাবে সাম্প্রদায়িকতার কালো বিষ ছড়িয়ে পড়ে। যা থেকে সহজেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্ম হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, দেশের ১৮ শতাংশ তরুণ মনে করে, সামাজিক মূল্যবোধের ধারাবাহিক অবক্ষয় ও অশিক্ষা বা ভুল শিক্ষার কারণে জঙ্গিবাদ বাড়ছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পাশাপাশি

সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবের কারণে জঙ্গিবাদ বাড়ছে এমনটি মনে করে ১২ শতাংশ তরুণ।[১৫]

সর্বোপরি দেশ ও জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, সচেতনতা ও দেশপ্রেমের অভাব এবং শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করার মানস থেকেও এদেশে সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তারের বৈশ্বিক কারণ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তারের ক্ষেত্রে বর্তমান বৈশ্বিক বৈরি পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী। বৈশ্বিক যে বিষয়গুলো সন্ত্রাবাদের জন্য দায়ী তাহলো-

(ক) রাজনৈতিক কারণ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তারের জন্য বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে। তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে দেশে অস্থিতিশীলতা ও অরাজগতা সৃষ্টি করে এবং সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্য ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ও শক্তিসমূহ বিকল্প পদ্ধতিতে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়ে দেশ ও সরকারকে দুর্বল করে। জঙ্গি দমনের নামে ঐ দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং সৈন্য ও সামরিক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে।

(খ) সাম্রাজ্যবাদ

রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন পৃথিবীজুড়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের প্রধান কারণ হলো শক্তিশালী রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসার এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নিজেদের সুবিধা আদায়ের জন্য বিভিন্ন দেশে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী গ্রুপ তৈরি করে। তাদেরকে ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক লোভ দেখিয়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্য করে এবং রাষ্ট্রের দুর্বল মুহূর্তে চাপ প্রয়োগ করে সুবিধা আদায় করে নেয়।

এছাড়া অনুন্নোত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে তাদের প্রভুত্ব ধরে রাখার জন্য ছোট ছোট রাজনৈতিক দলকে হাত করে। তাদেরকে ক্ষমতায় বসানোর লোভ দেখিয়ে

দেশের মধ্যে অস্থিরতা ও অরাজকতা বৃদ্ধির জন্য সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে। এভাবে তারা অনুন্নোত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

(গ) ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তারের অন্যতম কারণ। কারণে-অকারণে পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে মুসলিমগণকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ (সা.) ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করে অবমাননাকর বক্তব্য ও বেঙ্গাত্মক কার্টুন প্রচার করা হয়। ধারণা করা হয় যে, তারা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। পাশ্চাত্যের সংবাদমাধ্যমগুলোর বহুমাত্রিক মিথ্যা প্রচারণাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া পাশ্চাত্যজগত মুসলিমগণের বিরুদ্ধে সর্বত্র কঠোর দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করে। যার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা থেকেও জঙ্গিবাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের বিস্তার ঘটে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রেক্ষাপট

সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের প্রাচীনতম একটি সমস্যা। কালের পরিক্রমায় এটি নিজের রূপ বদলে বার বার ফিরে এসেছে নতুন আঙ্গিকে। বর্তমান সময়ের সন্ত্রাসবাদ মূলত ৯/১১ ও আরব বসন্তপরবর্তী ঘটনা। সন্ত্রাসবাদ এ দেশের সৃষ্ট কোনো উপাদেয় না হলেও বিশ্বায়নের উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলাদেশ এটি লাভ করেছে।[১৬] বর্তমান বাংলাদেশের জঙ্গি বা চরমপন্থী দলসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ধর্মভিত্তিক ও ধর্মহীন।[১৭] বাংলাদেশে ধর্মহীন বেশ কিছু জঙ্গি দল রয়েছে, এদেরকে ধর্মহীন চরমপন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব চরমপন্থী দলের উত্থান নিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। মূলধারা থেকে সরে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে ওঠে অসংখ্য চরমপন্থী দল। এসব চরমপন্থীরা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠলেও কেবল ঐ অঞ্চলেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সারা দেশে তারা অপতৎপরতা চালায়। ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষের কাছে এক সময় তারা পেশাদার অপরাধী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তবে বর্তমানে এসব চরমপন্থী দলের তৎপরতা পূর্বের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় না। ২০০৮ সালের ১৯ জুন *দৈনিক ইনকিলাব* -এর প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত ১০টি ধর্মহীন চরমপন্থী দলের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়। (১) পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি (এম.এল.জনযুদ্ধ), (২) পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল. লাল পতাকা), (৩) জাসদ গণবাহিনী, (৪) শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, (৫) বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, (৬) সর্বহারা, (৭) সর্বহারা মাদারীপুর, (৮) নিউ লাল পতাকা (নবগঠিত), (৯) সর্বহারা কামরুল গ্রুপ (বরিশাল), (১০) সর্বহারা জিয়া গ্রুপ (বরিশাল)।[১৮]

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সূচনা ১৯৯০-র মাঝামাঝি সময়ে। সাম্প্রতিক কালে ইসলামিক স্টেট বা আল-কায়েদার সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গিদের যোগাযোগ, হলি আর্টিজান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলা কিংবা আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের বাংলাদেশে উপস্থিতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ কার্যত পঞ্চম প্রজন্মে উপস্থিত হয়েছে। প্রথম প্রজন্ম হচ্ছে যারা আফগানিস্তানে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশে হরকাত-উল-জিহাদ-আল-ইসলাম বা হুজি প্রতিষ্ঠা করে। তাদেরকে আমরা ১৯৭৯-১৯৯২ পর্যায়ে দেখতে পাই। দ্বিতীয় প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে ১৯৯৬ সালে, যখন 'কিতাল-ফি-সাবিলিল্লাহ' বলে সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এটিই ১৯৯৮ সালে এসে জামায়াত-উল-মুজাহিদিন বা জেএমবি'তে রূপান্তরিত হয়, যার সঙ্গে হুজি'র যোগাযোগ ছিল ওতপ্রোত। তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হিযবুত-তাহরির। এদের সূচনা এবং বিকাশ বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। চতুর্থ প্রজন্মের জন্ম হয় জামাতুল মুসলেমিন নামে ২০০৭ সালে, পরে যা আনসারউল্লাহ বাংলা টিম নামে কার্যক্রম চালায়। পঞ্চম প্রজন্ম হচ্ছে যারা ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের উদ্ভবের পরে এর আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়, কেউ কেউ সিরিয়াতে যুদ্ধ করতে যায়।[১৯]

২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হোলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় এবং ৯ জুলাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাআত শোলাকিয়ায় ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নতুন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এর আগে দরিদ্র ও কম শিক্ষিতদের মধ্যে জঙ্গিবাদের প্রসার দেখা গেলেও এখন শিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন পরিবারের তরুণরা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা এবং বাংলাদেশে এর প্রয়োগ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। হত্যা, গুম, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন, এসিড নিক্ষেপ, জখম, ধর্ষণ, অবিচার, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, মানহানি, সম্পদহানি প্রভৃতি যে কোন কাজ ও পদ্ধতিতেই ত্রাস সৃষ্টি করা হোক না কেন ইসলাম সূচনাকাল থেকেই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইসলাম মানব জাতিকে যে কোনো ধরনের ত্রাস থেকে মুক্ত রাখতে একদিকে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করেছে, অপরদিকে অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে তা প্রতিহত করেছে। সাম্প্রতিক কালে সন্ত্রাসকে ধর্মের আবরণে আবৃত করতে জঙ্গি নাম দেয়া হয়েছে। তবে যারা এ কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকে জঙ্গি না বলে দাঙ্গাবাজ বা সন্ত্রাসী বলা শ্রেয়। কারণ তাদেরকে দাঙ্গাবাজ বা সন্ত্রাসী বললে তাদের নৈতিক মনোবল দুর্বল হবে এবং ধর্মের সাথে তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সম্পর্কহীনতার মনোভাব তৈরি হবে। ফলে এসব কাজের প্রতি নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হবে এবং অপরাধবোধ জাগ্রত হবে। অপরদিকে তাদের কার্যক্রম যে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয় সাধারণ জনগণের মধ্যে সে মনোভাব তৈরি হবে।

ধর্মের নামে যারা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত হয় তাদের মোকাবেলা করতে হবে ধর্মের শিক্ষা তথা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে। কারণ জঙ্গিবাদ একটি ভ্রান্ত আদর্শিক সমস্যা। যারা ইসলামের আবরণে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাদের বিশ্বাস, কুরআন-সুন্নাহতে জিহাদ ও কিতালের কথা আছে, সে কারণে তারা জিহাদে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং এটি তাদের জন্য ফরয। এই ভ্রান্ত আদর্শকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার আলোকেই মূলোৎপাটন করতে হবে। তাদের সামনে যদি কুরআন-হাদিসের আলোকেই এ সত্য উপস্থাপন করা যায় যে, জিহাদের নামে তারা যা করছে তা ইসলাম অনুমোদিত নয়; এটা মূলত জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ। তাহলে তাদের ভ্রম ভেঙ্গে যাবে এবং তারা পুনরায় সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসবে। এটিই এখন সময়ের অনিবার্য দাবি। তাই জঙ্গিবাদ নির্মূলে যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়টির মূলে প্রবেশ করে জঙ্গিদেরকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে ইসলামি শিক্ষা, মূল্যবোধ ও নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করা হলো।

হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা। এ ক্ষেত্রে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সাধারণ মানুষ কাউকেই ছাড় দেয়া হয় না। সমাজে ভীতি ছাড়ানোর জন্য নির্বিচারে নিতান্তই হত্যার উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়। এভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে তারা সমাজে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অথচ ইসলাম বিচারবহির্ভূত যে কোন হত্যাকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছে; কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডকেই বৈধ রাখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ "যাকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তোমরা তাকে হত্যা করো না। তবে আইনসম্মত হত্যা স্বতন্ত্র"।[২০]

ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ড কেবল একটি অপরাধ নয় বরং এটি গোটা মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আল-কুরআন বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলো, সে যেনো সকল মানুষকে হত্যা করলো।[২১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، "প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলিমগণ নিরাপদ"।[২২] এ কারণেই কেউ যদি কাউকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত হয়, ইসলামি বিধি অনুসারে আইনি পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে ব্যক্তি বা দলগতভাবে তাকেও হত্যা করা যায় না। চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কেবল আদালতই এমন ব্যক্তির শাস্তি কার্যকর করতে পারে। হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এমন, সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা, কাউকে যিম্মী করা এবং কারো জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না। বরং নিঃসন্দেহে তা ভয়ানক যুলমের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান জানার পরও কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, ইসলামি আইনে এর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর

হত্যার ব্যাপারে কিসাসের[২৩] হুকুম অবশ্যপালনীয় করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী"।[২৪] জাহিলি যুগে হত্যার শাস্তির ব্যাপারে গোত্রে গোত্রে, সবলে দুর্বলে ও কুলীনে অকুলীনে পার্থক্য করার নিয়ম ছিল। সম্ভ্রান্ত বা শক্তিশালী দলের এক ব্যক্তি দুর্বল অথবা নিম্ন শ্রেণির কারো দ্বারা নিহত হলে হত্যাকারীর সাথে তার গোত্রের বা দলের আরো কিছু লোককে হত্যা করা হতো। অন্যদিকে হত্যাকারী সবল বা সম্ভ্রান্ত হলে মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যাওয়া হতো। এ ধরনের নিয়ম রহিত করে আয়াতে কেবল হত্যাকারীকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৫]

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং নিরপরাধ মানুষের উপর যুলম প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। তিনি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করে বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন, إِنَّ دِماءَكُم، وأَمْوالَكم وأَعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস।[২৬] এ কারণেই তিনি সকল সামরিক অভিযানের আগে অভিযানের নেতাদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতেন: তাঁরা যেন সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে, শত্রুর মুখোমুখি হলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে। বিজয়ী হলে ছোট শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা না করে। ... ধর্মপরায়ণ সংসারত্যাগী ও মঠে বসবাসরতদের হত্যা না করে এবং তাদের মঠ ধ্বংস না করে।[২৭]

বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন অযুহাতে মানুষ হত্যা করে, মনুষ্যবাহী চলন্ত গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে, ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, অন্য ধর্মের লোকদের জীবনযাপন দুর্বিসহ করে তোলে; তাদেরকে যদি হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে ইসলামের এ বিধান ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা যায়, আশা করা যায়, তারা সন্ত্রাসের পথ পরিত্যাগ করবে।

বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা সৃষ্টি নিষিদ্ধ

জঙ্গি এবং সন্ত্রাসীরা সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে। নির্বিচারে মানুষ হত্যা, হত্যাকৃতের মরদেহের সাথে পৈশাচিক আচরণ, গ্রেনেড নিক্ষেপ,

অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে তারা সমাজে ভীতি ছড়িয়ে দিতে চায়। জান-মালের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। অথচ ইসলামে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। আল-কুরআনে এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ও সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا "পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না"।[২৮] ইসলাম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি; যারা বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের জন্য ইসলামে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ --- وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ --- فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

"ফিতনা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও। ... ফিতনা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ... যদি তারা তোমাদেরকে হত্যা করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করো"।[২৯] সন্ত্রাসের ভয়াবহতার জন্য আল্লাহ তা'আলা একে প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে না তারাও যে নিরাপদ নয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً "তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক যা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের উপরই আপতিত হবে না"।[৩০]

ইসলামের এই মহান শিক্ষা যদি সাধারণ মুসলিমগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়। বিশেষ করে মসজিদের পবিত্র জুমু'আর খুৎবাহ ও সাধারণ ধর্মীয় সভাসমূহের মাধ্যমে ইসলামের উপর্যুক্ত শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে সামাজিকভাবে এসকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে একটি জনমত ও জনপ্রতিরোধ গড়ে ওঠবে। সবাই সম্মিলিতভাবে এসকল দুষ্কৃতিকারীদের ঘৃণা ও সামাজিকভাবে প্রত্যাখান করবে। ফলে তাদের সন্ত্রাসী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে এবং সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।

সন্ত্রাস নির্মূলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করা

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে রাষ্ট্রকে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে। যে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

যাতে যে কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার আগে এর কঠিনতম ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা মনে করে ভীত হয় এবং তা থেকে বিরত থাকে। ইসলাম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিকে যেমন ছিলেন দয়ার সাগর, উম্মতের কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল, ক্ষমা ছিল যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য; অন্যদিকে যারা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জান-মালের ক্ষতি করে তাদেরকে শাস্তি দানে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাদেরকে শাস্তিদানে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সন্ত্রাসীদেরকে এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন যা দেখে কোনো মানুষের পক্ষেই সন্ত্রাসবাদের দিকে পা বাড়ানো মোটেই সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ

একবার বাহরাইন থেকে উকল বা উরায়না গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদিনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মহানবি (সা.) তাদেরকে সাদকার উটের চারণভূমিতে গিয়ে উটের পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে গেল। তারপর তারা (তারা সাদকার উটের প্রশ্রাব ও দুধ পান করে) সুস্থ হয়ে নবি (সা.) এর উটের রাখাল ইয়াসারকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পলায়ন করে। সকালের দিকে মহানবি (সা.) -এর নিকট সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। দুপুরের দিকে তাঁরা তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। অতঃপর মহানবি (সা.)-এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হলো এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদেরকে ফেলে রাখা হলো। (এ শাস্তির প্রচণ্ডতা এমন ছিল যে) তারা পানি চাচ্ছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি।[৩১] মহানবি (সা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল মহামানব। অথচ উল্লিখিত হাদিসে দেখা যায় যে, তিনি উরায়না গোত্রকে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জান-মালের ক্ষতি করায় তাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন না করে অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছিলেন। এটিই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান।

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অনুরূপ শাস্তির কথা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ "যারা আল্লাহও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি"।[৩২]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ সন্ত্রাসবাদের জন্য অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে মাতৃভূমিকে নিরাপদ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশনার বাস্তবায়ন করে মহানবি (সা.) সন্ত্রাস দমনে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেছেন। মূলত সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে এ ধরনের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। অতএব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য যদি ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক এ শাস্তির বিধান প্রয়োগ করা যায় তাহলে শাস্তির ভয়াবহতা বিবেচনা করে অনেকেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে।

অন্যের ক্ষতি নিষিদ্ধ

জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা ব্যাপকভাবে দেশ ও জাতির জান-মালের ক্ষতি সাধন করে। মানুষকে হত্যা করা, অর্থ–সম্পদ বিনষ্ট করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইত্যাদি সকল কাজে অপরের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়–বাণিজ্য, নিরাপদ চলাফেরা ও শান্তিপূর্ণ জীবন সন্ত্রাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোদ্দাকথা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ব্যক্তির জীবন ও সম্পদে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। এ কারণেই যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলতেন: وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً "অসহায় অতিশয় বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, নিরপরাধ নাবালক শিশু ও কিশোর এবং অবলা নারীদের হত্যা করবে না"।[৩৩] বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমাদের প্রতি কৃত ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গৃহাভ্যন্তরে বসবাসকারী লোকদের গায়ে হাত দিও না। নারীদের সম্মান কর। দুগ্ধপোষ্য শিশু আর রোগ শয্যার মানুষকে আঘাত করো না। বাধা প্রদান করে না এমন অধিবাসীদের গৃহ ভেঙ্গে দিও না। তাদের জীবনধারণের উপকরণসমূহ ও ফলের গাছ নষ্ট করো না। খেজুর গাছের ক্ষতি করো না। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি

যিম্মির[৩৪] প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে আমি পরলোকে তার জন্য অভিযোগকারী হব।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রণীত মদীনা সনদের একটি ধারায় সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় যে, তাকওয়া অবলম্বনকারী ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের হাত সমবেতভাবে ঐ সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হবে যারা বিদ্রোহী হবে অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন, বিদ্বেষ অথবা দুর্নীতি ও ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হবে। তারা সকলে সমভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে যদি সে কারো আপন পুত্রও হয়ে থাকে।[৩৬] ইসলামের এসকল সুমহান শিক্ষা যদি সমাজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে সমাজের কোনো সদস্য অপর কোনো সদস্যের অকল্যাণ কিংবা ক্ষতি সাধন করতে উদ্বুদ্ধ হবে না; অপরের ধন-সম্পদ তার কাছে আমানতরূপে নিরাপদ থাকবে।

জোরপূর্বক ধর্মান্তর নিষিদ্ধ

পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর উম্মাহকে দান করেছেন কিন্তু কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার আদেশ তিনি দেননি। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও কল্যাণকামিতার পন্থা অবলম্বনের জন্য এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে উত্তমভাবে আলোচনার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৭] তাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সমাজে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোরজবরদস্তি করে বা বল প্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণ করানোর কোনো সুযোগ নেই, দৃষ্টান্তও নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কাজ ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া; লোকদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো নয়। জোরপূর্বক ধর্মান্তর সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "দীনের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে"।[৩৮]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি মদিনার কতিপয় আনসার সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের আগমনের পর তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাদের অনেকের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল, যারা ইয়াহূদি বা খ্রিস্টান ছিল। তাই তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য জোরজবরদস্তি ও চাপ প্রয়োগ

করতে থাকে। তাই তাদেরকে এরূপ জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো থেকে বিরত থাকার জন্য মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন।[৩৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমেরিকান পণ্ডিত Edwin Calgary বলেন, পবিত্র কুরআনে একটি উদারনৈতিক আয়াত রয়েছে যা সত্য ও বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ এবং এটা সকল মুসলিম অবগত। প্রত্যেকেরই এটা জানা দরকার যে, ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই।[৪০] সুতরাং পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের শানে নুযূল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য জোরজবরদস্তি বা বল প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই; এমনকি সন্তানের কল্যাণকামী কোনো পিতা-মাতাও যদি নিজ সন্তানকে মুসলিম হওয়ার জন্য জোর করে, তাও বৈধ হবে না।

বল প্রয়োগে ধর্মান্তরিত করাকে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে: مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ "আল্লাহর বাণী প্রচার করা ছাড়া রাসূলের কোন দায় নেই"।[৪১] فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ "কাজেই আপনি উপদেশ দিতে থাকুন; আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তাদের কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক নন"।[৪২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ "আপনার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পৃথিবীর সব লোকই ঈমান আনত। তাহলে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জোর প্রয়োগ করবেন?"[৪৩]

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রচারে বা ইসলাম গ্রহণে কাউকে জোরজবরদস্তি বা বল প্রয়োগের ন্যূনতম সুযোগ নেই, এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সকলের নিকট ইসলামের সুমহান বাণী ও শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ থাকলেও কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় নয়। যদিও বাংলাদেশে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তার পরেও বিপথগামী তরুণদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া গেলে তাদের মনে ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা সৃষ্টি হবে।

ভিন্ন ধর্মের উপহাস ও ভর্ৎসনা করা নিষিদ্ধ

বর্তমান সময়ে বাকস্বাধীনতার নামে বিভিন্ন ধর্মের উপাস্য, নবি-রাসূল ও প্রেরিত ঐশী কিতাবের সমালোচনা, উপহাস-ভর্ৎসনা ও নিন্দা এমনকি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। ফলে বিশ্বে ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে এবং কোনো কোনো সময় এরই ফলশ্রুতিতে ধর্মানুরাগীদের মধ্যে বিশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ব ইসলামের মূল ভিত্তি এবং তাওহীদবিরোধী ভাবধারার সাথে ইসলামের কোনো আপস নেই। তাই মূর্তিপূঁজা বা কোনো দেবদেবীর উপাসনা তো দূরের কথা, সে সবের অস্তিত্বও ইসলাম স্বীকার করে না। অথচ ইসলামই আবার সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অন্য কোনো ধর্মের উপাস্য বা দেবদেবীকে উপহাস, ভর্ৎসনা বা নিন্দা করতে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে তোমরা তাদের গালি দিও না। কেননা; তাহলে তারা অজ্ঞাতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের কাজ শোভন–সুন্দর করে রেখেছি"।[৪৪]

কুরআন মাজিদের উল্লিখিত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করে সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং অন্য ধর্মাবলম্বী এবং তাদের উপাস্যকে ভর্ৎসনা বা উপহাস করা নিষিদ্ধ। তাই এ থেকে বিরত থাকা সকলের কর্তব্য। ইসলামের এ শিক্ষা আমাদের সমাজে বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে ধর্মকেন্দ্রিক সহিংসতা ও ত্রাস সমূলে উৎপাটন করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সুবিচার নিশ্চিতকরণ ও অবিচার প্রতিরোধ করা

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অবিচার প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা না হলে তা সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে। আবার জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা নিজেরাও সামাজিক জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। অকারণে যে কাউকে হত্যা করা, জিম্মী করা, অর্থ–সম্পদ ছিনতাই করা, অগ্নিসংযোগ করা ইত্যাদি কাজগুলো জঙ্গিদের বিচারহীনতার দৃষ্টান্ত। অথচ ইসলামে কোনো পর্যায়েই কারো প্রতি অন্যায়–অবিচার করার সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের অবিচার নিষিদ্ধ করে মুসলিমগণের জন্য ন্যায়পরায়ণতার উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা তোমাদের মাতাপিতা বা আত্মীয়–স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক আল্লাহ তাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। তাই তোমরা ন্যায়বিচারে তোমাদের কামনা–বাসনার অনুসরণ করো না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে–পেঁচিয়ে কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখ, তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল খবর জানেন"।[৪৫]

ইসলামে সুবিচারের ধারা এমন প্রবলভাবে অনুসরণ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর যুগে এক ইয়াহুদির বিরুদ্ধে মামলায় তাইমা ইবনে উবাইরাক নামক একজন মুসলিম নারী হেরে যান।[৪৬] বনূ মাখযুম গোত্রের এক অভিজাত নারীর বিরুদ্ধে চুরির শাস্তি কার্যকর করতে দ্বিধা করায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেন, والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها- " ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম"।[৪৭] হযরত আলী (রা.) মিসরের গভর্নর মালিক ইবনে হারিসকে লেখা একটি চিঠিতে উপদেশ হিসেবে উল্লেখ করেন, বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে নির্ভয়ে কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।[৪৮] অতএব, উপরোক্ত কুরআনিক শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজে অবিচার প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কার্যক্রম অনেকটাই হ্রাস পাবে।

সম্পদ লুণ্ঠন নিষিদ্ধ

অন্যের সম্পদ ছিনতাই, আত্মসাৎ ও লুণ্ঠনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। চরমপন্থী জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা অন্যের অর্থ–সম্পদ ছিনতাই করে। কখনও কখনও এ কাজকে তারা দীন প্রচারের সহযোগী বিষয় হিসেবে প্রচার করে। ইসলাম এ ধরনের কাজকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং এর প্রতিকারের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "হে মুমিনগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করো না। তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে লেনদেন করতে পার"।[৪৯] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "তোমরা জেনেবুঝে মানুষের সম্পদের অংশবিশেষ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের জন্য বিচারকদের কাছে পেশ করো না"।[৫০] ইসলামের এ নির্দেশনার পরও যারা অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ "চোর পুরুষ ও চোর নারী– তাদের উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকাজের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি"।[৫১]

সুতরাং ইসলামে চাঁদাবাজি, আত্মসাৎ ও লুণ্ঠনে কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশে যারা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পদ বিনষ্ট করে এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, তাদেরকে ইসলামের এ শিক্ষা যথাযথভাবে অবহিত করা সম্ভব হলে তারা এ পথ পরিত্যাগ করতে পারে।

সম্মানহানি নিষিদ্ধ

ধর্মের নামে পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, জাতীয় নের্তৃবৃন্দ, দেশপ্রেমিক ও সম্মানিত আলিমগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে তাদের মানহানির চেষ্টা করা। অনেক ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও আলিমগণকে মুরতাদ ঘোষণা করা, জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি অকারণে নাস্তিকতার অপবাদ আরোপ করা জঙ্গিদের মুখ্য কর্মে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলামে এভাবে মানুষকে অসম্মানিত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ --- وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء --- وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ---وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ -

"হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে ... কোনো নারীও যেনো অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে।.... তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত খারাপ। --- তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কোরো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশতো খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর"।[৫২]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কোনো ব্যক্তি অপমানিত হতে পারে এমন যে কোনো আচরণ, চাই তা উপহাস করা, দোষারোপ করা, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা কিংবা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অনুসন্ধান করা- এমন সম্মানহানিকর সকল আচরণকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষকে সম্মানহানি না করার কুরআনের শিক্ষাকে যদি সাধারণ মুসলিমগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে আশা করা যায়, প্রকৃত কোনো মুমিন ব্যক্তি এ জাতীয় কাজের সাথে আর সম্পর্ক রাখবে না।

দীন শিক্ষা প্রবর্তন আবশ্যক

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বাংলাদেশে তরুণদেরকে জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত করা সহজ হচ্ছে। তাদেরকে ধর্মীয় আবেগ ও সহজে জান্নাত লাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত করা সম্ভব হয়। ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা, কম জানা বা ভুল জানার কারণে তারা ইসলামের নামে এমন কাজে জড়িত হচ্ছে, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইসলামের শিক্ষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর মারণাস্ত্র হতে পারে। বাংলাদেশে যারা ইসলামের নামে মানুষ হত্যা করছে, ভয়ঙ্কর সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্ম দিচ্ছে, তারা যদি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতো তাহলে এ কাজ থেকে অবশ্যই নিজেদেরকে সরিয়ে নিতো। এ বোধ থেকেই *দৈনিক প্রথম আলোর* এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫৩]

বাংলাদেশে ইসলামের নামে বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। এগুলোর মধ্যে হিযবুত তাহরীর, হিযবুত তাওহীদ, জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি), উলামা আঞ্জুমান আল-বাইয়্যিনাত, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, তাআমির উদ্দীন বা হিজাব আবু উমর, আল্লাহর দল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৫৪] লক্ষ্যণীয় যে, এ দলগুলোর গঠন বা পরিচালনার সাথে বাংলাদেশের কোনো প্রথিতযশা আলেম বা ইসলামী ব্যক্তিত্ব জড়িত নন। যারা এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক, অর্থসংস্থানকারী তারা কেউ-ই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নন। মূলত ইসলামের নামে তৈরি এ দলগুলো ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য কাজ করে চলেছে। এ কাজে তারা ধর্মভীরু গরীব মুসলিম ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে কেবল সকলের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক শিক্ষা না থাকার কারণে। এ প্রেক্ষাপটে এটি তাই সময়ের অনিবার্য দাবি যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীর জন্য ইসলাম শিক্ষাকে (ধর্ম শিক্ষা) আবশ্যিক করা। এটি করা সম্ভব হলে এবং যথাযথ মানের দীনি আলিম ও শিক্ষাবিদগণ কর্তৃক শিক্ষাপ্রদান সম্পন্ন করা গেলে নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রবল ধর্মীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আলিম সমাজের দায়িত্ব

বাংলাদেশসহ মুসলিমদেশসমূহ হতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে হলে আলিম সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও কুরআন হাদিসের যথার্থ ব্যাখ্যা সকলের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। কারণ, বাংলাদেশসহ উন্নয়শীল মুসলিম দেশসমূহে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবহ গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে; অথবা যে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অবরণ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই ধর্মীয় প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে ধর্মীয়ভাবে একে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু এই কথাগুলো যদি দেশের স্বনামধন্য কোনো আলিম না বলে প্রশাসক বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বলে তাহলে তাতে সুফল পাওয়া যাবে না বরং

সন্ত্রাসী-জঙ্গবাদী গোষ্ঠীগুলো উল্টো এ সকল সোচ্চার ব্যক্তিদেরকে তাদের লক্ষে পরিণত করার রসদ পেয়ে যাবে। তাই রাষ্ট্রের আলিম সমাজের দায়িত্ব হলো ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে ঈমানি দায়িত্ব পালন করে দেশের সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। এটি আলিম সমাজের অন্যতম দায়িত্ব, কেননা পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যেমন সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা নির্মূলে কঠিন শাস্তির বিধানের উল্লেখ রয়েছে তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজে ত্রাস সৃষ্টিকারীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। অন্যায় ও যুলম প্রতিরোধ করার জন্য আলিম সমাজকে বিশেষভাবে আহবান করেছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে নসিহা তথা ভাল ও কল্যাণকর কাজ প্রসারের পাশাপাশি অন্যায় কাজসমূহের প্রতিরোধ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম"।[৫৫]

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেদের সামর্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী হিসবাহ'র দায়িত্ব পালন করার জন্য আলিমগণের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়; যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (কথার মাধ্যমে বিভিন্ন উপদেশ, নসীহত) দ্বারা এর প্রতিরোধ করে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে, তবে এটি হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক"।[৫৬]

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে যদি সমাজের প্রসিদ্ধ আলিমগণ ইসলামের সঠিক মর্মার্থ মানুষের সামনে তুলে ধরেন তাহলে সাধারণ মুসলিমগণ তাদের দেখানো পথ অনুসরণ করে ইসলামের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং যারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত রয়েছে তাদের মনের মধ্যে ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হবে, তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসবে।

ধর্মীয় উদ্দীপকসমূহের সঠিক ধারণা প্রদান

ইসলামের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক রয়েছে। ধারণা করা যায়, এগুলোর অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে ফেলা হয়। এগুলোর মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি, ইহসান বা সদাচরণ, খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা, আখলাকে হামীদাহ বা উত্তম চরিত্র, আখিরাতে জবাবদিহিতার প্রেরণা এবং জিহাদে লিপ্ত হয়ে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। অথচ কারো মধ্যে যদি সত্যিকারের তাকওয়া তৈরি করা সম্ভব হয়, সে প্রকাশ্যে বা গোপনে সকল পাপ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। ইহসান যদি কারো নৈতিকতার অংশ হয়, সে কাউকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। খিদমতে খালককে যদি কেউ নিজের কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করে, সে কখনো কাউকে কষ্ট দেবে না। আখলাকে হামিদাহ অর্জন যদি কারো লক্ষ্য হয় সে মানুষ হত্যা বা আহত করার কাজ থেকে দূরে থাকবে। যার মধ্যে আখিরাতে জবাবদিহিতার প্রকৃত চেতনা বিকশিত হবে, সে কোনোক্রমেই ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত হবে না। আর যে ব্যক্তি শাহাদাতের তামান্না পোষণ করবে, জিহাদকে জীবনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে সেতো মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের যিম্মাদার হয়ে যাবে। কাজেই সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় উদ্দীপকসমূহের সঠিক ধারণা প্রদান করে মন থেকে ধর্মান্ধতা দূর করা জঙ্গি দমনের কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে।[৫৭] এজন্য ইসলামের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থী সদাচার, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, পরোপকার, কল্যাণকামনা, উদারতা, স্বদেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, দয়া, মায়া এবং দরদ ও ভালবাসাকে জীবনের মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। মানুষকে কষ্ট দেয়া, হত্যা করা, অর্থ–সম্পদ–জীবন ধ্বংস করার মতো কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে।

গবেষণা ফলাফল

আলোচ্য প্রবন্ধে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের প্রকৃতি, অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান এবং বাংলাদেশকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা প্রয়োগ প্রক্রিয়া নিরূপণে পরিচালিত পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রতিভাত হয়।

(ক) বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক ও ধর্মহীন চরমপন্থী উভয় ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অস্তিত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কোনো রকম সংশ্রব নেই।

(খ) ধর্মের নামে পরিচালিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমূলক কর্মকাণ্ডের নেপথ্যেও ধর্মের সংশ্রব নেই। স্বার্থবাদী ও ষড়যন্ত্রী লোকেরা ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রক্ষা বা অর্জনের জন্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মীয় আবেগ ও অনভূতিকে ব্যবহার করে মাত্র।

(গ) বাংলাদেশের মানুষ ইসলামের শিক্ষা ও নীতির প্রতি মানসিকভাবে অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল। তবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও দর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত করার যে কোনো পদক্ষেপে তারা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে সুপারিশমালা

১. সর্বস্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রচলন করা। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

২. কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার আলোকে জিহাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট করা। দেশবরেণ্য আলিমগণের সমন্বয়ে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল মিডিয়ায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও সৌন্দর্য তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।

৩. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, মসজিদ ও মক্তব ভিত্তিক সন্ত্রাস বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৪. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পরিচালনা করা।

৫. সকল ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের প্রতি কটাক্ষ, অবহেলা কিংবা অপমান ও অবমাননাকর কথাবার্তা, লিখনী বা আচরণ বন্ধ করা। প্রয়োজনে এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করা।

৬. বাক স্বাধীনতা ও নিজ নিজ অধিকার, দাবী ও বক্তব্য সহজে তুলে ধরার পরিবেশ সৃষ্টি করা। সকলের জন্য আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।
৭. বেকারত্ব ও দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য যথাসম্ভব হ্রাস করা। প্রাথমিকভাবে সকলের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮. পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের সমস্ত সুযোগ বন্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৯. সর্বোপরি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সর্বস্তরে ইসলামি অনুশাসন অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

উপসংহার

সন্ত্রাস নির্মূলে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ এবং সন্ত্রাস, রাহাজানি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজাকতার প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বাস্তবায়ন- পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে বলা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে সংঘটিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে সহসাই দেশকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি ভেদাভেদ ভুলে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আস্থা ফিরে আসবে। এতে উন্নয়ন ও অগ্রগতির চির আরাধ্য পথে বাংলাদেশের গৌরবময় পথপরিক্রমা অধিকতর অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। মানুষের বাহ্যজগত ও অন্তরজগত উদ্ভাসিত হবে অমিয় সুখের মঙ্গলালোকে। শেষ পর্যন্ত জয় মানবতারই হবে, কারণ ইসলাম মানবতার এক অবিসংবাদিত, অবিস্মরণীয় ও অনন্য ত্রাণকর্তা। তাই মানবতার মুক্তির জন্যই এর অনুশীলন ও অনুসরণ অনিবার্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ২০১৬ সালের ১০ জুন পর্যন্ত প্রায় দেড় বছরে এ রকম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৪৯টি। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীও রয়েছেন। [সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ জুন ২০১৬, পৃ. ১, কলাম: ৮]

২ মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (সম্পা), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (৭ম পুনমুদ্রণ), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০), পৃ. ১১১৩

৩ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (২১তম পুনমুদ্রণ), (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮), পৃ.৬৬১

৪ মাহমুদুল হাসান, 'সন্ত্রাস নয় শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অন্বেষা', *দৈনিক ইনকিলাব* (৮ আগস্ট, ২০০০), পৃ. ১০

৫ Crowther, Jonathan (Editor) *Oxford Advanced Learner`s Dictionary* (5^{TH} ed.). (Great Clarendon Street, Oxford: Oxford University Press,1999), p. 1618

৬ আল-কুরআন, ২: ১১,১৯১

৭ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *আল-মু'জামুল মুফাহারাস লিআলফাযিল কুরআন* (কাহেরা: দারুল হাদীস, ১৩৬৪ হি.), পৃ. ৫১২, ৫১৯

৮ তরজমা ও সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, আল-কুরআনুল করীম (৫০তম মুদ্রণ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ৪৭

৯ ড. আ. ন. ম রইছ উদ্দিন, *তানভীরুল কুরআন* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ২৭

১০ মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮

১১ খন্দকার আল মঈন বিপিএম (বার), 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ: আমাদের করণীয়', *দৈনিক সমকাল*, প্রকাশ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

১২ আশরাফুল ইসলাম, 'জঙ্গিবাদ বাড়ছে দারিদ্র্যে ও ধর্মের ভুল ব্যাখ্যায়', *দৈনিক প্রথম আলো*, আপডেট: ১৮ জুলাই ২০১৭, গ্রহণের সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৩

১৩ আশরাফুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।

১৪ *দৈনিক প্রথম আলো*, বাণিজ্যিক ডেস্ক, আপডেট: ৯ ডিসেম্বর ২০২১, গ্রহণের সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৩

১৫ আশরাফুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।

১৬ খন্দকার আল মঈন, প্রাগুক্ত।

১৭ ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম, *জিহাদ ও জঙ্গিবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (রাজশাহী: সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২০১০), পৃ. ১০০

১৮ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ জুন ২০০৮, পৃ. ১, ১ম কলাম; ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

১৯ আলী রীয়াজ, 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ কী?' www.dw.com, ২০ জুলাই ২০১৬, গ্রহণের সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৩

২০ আল-কুরআন, ১৭: ৩৩

২১ আল-কুরআন, ৫: ৩২

২২ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯হি.), হাদিস নং ২৪৭৩

২৩ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারীকে বা আহতকারীকে অনুরূপভাবে হত্যা বা আহত করাকে কিসাস বলা হয়। দ্র. আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরাব*, বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, ১৪১১ হি., খ. ৫, পৃ. ৩৬৫২; আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *বুখারী শরীফ*, সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ৭, অনুচ্ছেদঃ ২২৭৬, টীকাঃ ১, পৃ. ২৭০

২৪ আল-কুরআন, ২: ১৭৮

২৫ আল-কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২৬ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (রিয়াদঃ দারুসসালাম, ১৯৯৭), খ. ৫, হাদিস নং-৪৪০৬

২৭ সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৩০

২৮ আল-কুরআন, ৭: ৫৬

২৯ আল-কুরআন, ২: ১৯১

৩০ আল-কুরআন, ৮: ২৫

৩১ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদিস নং- ৪১৯২

৩২ আল-কুরআন, ৫: ৩৩

৩৩ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২৬১৪

৩৪ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণকে যিম্মী বলা হয়। কারণ যিম্মী ব্যক্তি মুসলিমাগণের রক্ষণাবেক্ষণে, নিরাপত্তায়, দায়িত্বে ও অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্র. সিরাজ উদ্দিন আহমাদ, 'যিম্মা', *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২১, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ৬০৫

৩৫ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ* (ঢাকা: রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৬৩), পৃ. ৭২-৭৩

৩৬ আব্দুল মালেক ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবুল আরাবি, ১৯৯০),খ. ২, পৃ. ১৪৩- ১৪৫; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *হযরত রাসূলে করীম (সা.) : জীবন ও শিক্ষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃ. ৩১৮

৩৭ আল-কুরআন, ১৬: ১২৫; ২৯: ৪৬

৩৮ আল-কুরআন, ২: ২৫৬

৩৯ Abu Al Hasan Ali Al Wahidi, *History of the Revelation* (Beirut: Quranic Science, 1979), pp. 114-115

৪০ Quailar Young, *The Near East: Society And Culture*, Trans. Abdu-arrahman Ayoob (Qairo: Dar Al- Nashir Almutahida. N.d), p. 163

৪১ আল-কুরআন, ৫: ৯৯

৪২ আল-কুরআন, ৮৮: ২১-২২

৪৩ আল-কুরআন, ১০: ৯৯

৪৪ আল-কুরআন, ৬: ১০৮

৪৫ আল-কুরআন, ৪: ১৩৫

৪৬ মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *আত-তারীখুল ইসলামী* (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ. ১৮৯

৪৭ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৭৮৭

৪৮ খুরশিদ আহমদ (অনূদিত), *হযরত আলী (রা.)-এর প্রশাসনিক চিঠি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৭

৪৯ আল-কুরআন, ৪: ২৯

৫০ আল-কুরআন, ২: ১৮৮

৫১ আল-কুরআন, ৫: ৩৮

৫২ আল-কুরআন, ৪৯: ১১-১২

৫৩ *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ অক্টোবর ২০০৯, পৃ.৩

৫৪ *সাপ্তাহিক ২০০০*, ৩০ অক্টোবর ২০০৯, বর্ষ ১২, সংখ্যা-২৫, পৃ. ১২

৫৫ আল-কুরআন, ৩: ১০৪

৫৬ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী, *আস-সহীহ লিমুসলিম* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি.), হাদিস নং- ৪৯

৫৭ *সাপ্তাহিক ২০০০*, প্রাগুক্ত।